

মুখবন্ধ

পথে এবার নামো সাথী পথেই হবে এ পথ চেনা
জনশ্রোতে নানান মতে মনোরথের ঠিকানা
হবে চেনা হবে জানা।

সলিল চৌধুরী

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কবিতার নাম ‘সংবাদ মূলত কাব্য’। দীপেশ চক্রবর্তীর লেখা বাংলা প্রবন্ধসংকলন *মনোরথের ঠিকানা*-র পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে মনে হলো সেটা একটু বদলে বলা যায়, তাঁর ক্ষেত্রে ইতিহাসচর্চা মূলত না-হোক অন্তত আংশিকভাবে আত্মজৈবনিক। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে নানা ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। অনেক সময়ে যা আবার উনি যেন চাবির মতো ব্যবহার করে এমন-এক জাদুঘরে আমাদের নিয়ে যান যেখানে একটা সময়ের নিপুণ চালচিত্র ফুটে ওঠে, তখন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ এবং স্মৃতিমেদুরতা অতিক্রম করে তা হয়ে ওঠে সর্বজনীন। এর একটি সুন্দর কিন্তু মর্মস্পর্শী উদাহরণ হলো বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম রেজিস্ট্রার দ্বিজেশ চক্রবর্তীর অল্প কিছুদিন চাকরি করার পর কর্মস্থলে রাজনীতির চক্রে পদত্যাগের ঘটনা, যা বর্ণিত হয়েছে কিছু প্রতিষ্ঠানগত চিঠির সূত্র ভিত্তি করে লেখা ‘বিজ্ঞান মন্দিরে অনর্থ, বা একটি পদত্যাগের কাহিনি’ প্রবন্ধে। এক ব্যক্তির সঙ্গে একটি সংগঠনের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের বাঙালি সমাজ এবং প্রাতিষ্ঠানিক চালচলনের ইতিহাস খুব নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু প্রবন্ধের শেষে একটিমাত্র বাক্য প্রবন্ধটিকে এক আকস্মিক মানবিক মাত্রা দেয়: ‘দ্বিজেশ চক্রবর্তী আমার বাবা।’

All politics is personal বলে একটা কথা আছে, তার মতো বলা যায়, ‘All history is personal.’ অন্য লেখাগুলির মধ্যে কখনো তাঁর সময়ের কলকাতার বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সমাজের পুরোনো বিতর্ক, কখনো প্রিয় পুরোনো বাংলা গান, আবার কখনো যে অগ্রজ ঐতিহাসিককে এক সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল বলে এড়িয়ে গেছেন, তাঁর সঙ্গে

কাল্পনিক কথোপকথনে নানাভাবে ফিরে এসেছে তাঁর নিজস্ব জীবনের যাত্রাপথের নানা মুহূর্তের জীবন্ত চালচিত্র।

হয়তো আত্মানুসন্ধানের এই প্রবণতা আরও মৌলিক, যার সূত্র টানা যায় জ্ঞানচর্চায় সেই পুরোনো মন্ত্র। আত্মানাং বিদ্ধি। কিন্তু ‘আত্মা’ তো মানচিত্রে কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নয় যে ঠিকানায় পৌঁছে তার অফিসফ্রি জানা হয়ে গেলে কাজ শেষ। আত্মানুসন্ধান স্বভাবতই এক পথ-পরিক্রমা। সময়ের নিপুণ তুলি আমাদের স্মৃতি এবং চেতনায় জটিল আঁচড় কাটে, পরিবর্তনের স্রোতে আমরা ভেসে যাই কালের যাত্রায়, দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে। পথিক, পথ এবং গন্তব্য সবই যোহেতু ক্রমপরিবর্তনশীল, আত্মানুসন্ধানও তাই যেন খানিকটা সেই অমাবস্যার রাতে অন্ধকার ঘরে কালো বেড়াল খোঁজার মতো এক জটিল দার্শনিক ধাঁধা।

কিন্তু তাহলেও নিজেকে জানতে হয়, এ-তুমি কেমন তুমির মতোই আমাদের প্রতিনিয়ত জিজ্ঞেস করতে হয় এ-আমি কেমন আমি, এলাম কোথা থেকে, আর যাচ্ছিই-বা কোনখানে? এখানে কিছু পক্ষপাত সবসময় কাজ করে। স্মৃতি সততই সুখের কারণ আমরা নিজেদের জীবনের দুঃখের এবং অপ্ৰীতিকর নানা ঘটনা ভুলে যাই, চাপা দিয়ে রাখি—বিশেষত তা যদি নিজের মুখোমুখি হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মধ্যেও নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, নিত্য পরিমার্জন চলতে থাকে। আত্মোপলব্ধির বিরল যে-মুহূর্তে মনে হবে, যাক এতদিনে ঠিকানা খুঁজে পাওয়া গেল, ভেতর থেকে এক রাখালবালকের কণ্ঠ শোনা যাবে, ওরে পাগল হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। অথবা, বইয়ের নামের সূত্র ধরে বলতে গেলে, নেপথ্যে বেজে উঠবে সেই অমোঘ গান: ‘পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে এ পথ চেনা...।’

এই বইটির মুখবন্ধ লেখার অনুরোধ আসে যখন দীপেশদার কাছ থেকে, একইসঙ্গে আনন্দিত এবং শঙ্কিত হয়েছিলাম। আমি অর্থনীতির গবেষক, খটোমটো বিষয় নিয়ে দুর্বোধ্য গবেষণাপত্র লিখে দিব্যি চলছিল, মধ্যবয়সে উপনীত হয়ে বয়সোচিত অস্তিত্বের সংকট নিরসন করতে খানিক বাংলা ও ইংরেজিতে বিষয়ের বাইরেও একটু লেখালেখি শুরু করেছি কিছুদিন হলো (যার পেছনে এই বইয়ের প্রকাশক অনুষ্ঠান-এর সম্পাদক অনিল আচার্যর প্ররোচনার একটা বড়ো ভূমিকা আছে)। কিন্তু দীপেশদার মতো বরণ্য এক ঐতিহাসিকের বইয়ের মুখবন্ধে ‘বহিরাগত’ হিসেবে আমি যে কী লিখব, তা ভেবে তো ঘেমেয়ে একশা! যদিও দীপেশদার সঙ্গে আড্ডার বৈঠকে যে-রকম আলোচনা হতো, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং পরিবেশনার মনোগ্রাহিতায় এই বইটির প্রতি পাতাতে তারই নির্যাস, মনে হলো দ্বিধার বাধা পার হয়ে নেমেই পড়ি পথে, কীসের মানা!

২

শুরু করি এই বইয়ে ইতিহাস বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ধারার পদ্ধতিগত কিছু আলোচনার এবং বিতর্কের (যা ‘ইতিহাসের কড়চা’ এবং ‘জনশ্রোতে, নানান মতে’ এই দুই অনুচ্ছেদে সংকলিত হয়েছে) দ্বারা অনুপ্রাণিত চিন্তা দিয়ে।

ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও ইতিহাস নির্মাণের প্রক্রিয়ার যে-কথা একটু আগে বললাম, তা যেমন এক ব্রহ্মপরিমার্জনশীল আখ্যানের পাণ্ডুলিপি, বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রেও কথটা সত্যি। অর্থনীতি যেমন তোতাপাখির মতো চাহিদা-জোগান (বা নয়্যা-উদারবাদ আর পুঁজিবাদ) আওড়ানো, বা বৃদ্ধির হারের পাটিগণিত নয়, সে-রকম ইতিহাসও স্কুলের পাঠ্যবইয়ে পড়া শুকনো তথ্যের ফিরিস্তি নয়। দুই ক্ষেত্রেই (এবং সমাজবিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার অন্যান্য শাখাতে) যখন সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আমরা চর্চা করি, তা মূলত বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক আখ্যানের মধ্যে এক বাক্যলাপ, যা আবার কখনো কখনো আংশিকভাবে হলেও বিতর্কের রূপ নেয়।

যেমন, জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের মূল আখ্যান হলো, ব্রিটিশরা বাণিজ্যের অজুহাতে ভারতে আবির্ভূত হয়ে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করেছিল যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ নিষ্কাশন। আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আখ্যানে উপনিবেশগুলোকে সভ্যতার আলো দেখানো, সেখানে আইনব্যবস্থা, গণতন্ত্র এবং পরিকাঠামোর পত্তন করাই ছিল উপনিবেশবাদের মূল উদ্দেশ্য। মার্কসবাদী আখ্যানে উপনিবেশবাদ ছিল পুঁজির বাজার, সুলভ শ্রম ও প্রাকৃতিক উপাদানের সম্মানে জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বায়িত হবার এক অমোঘ প্রক্রিয়া।

সমসাময়িক ভারতে বয়ানে-বয়ানে এই ঠোকাঠুকির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো পাঠ্যবইয়ের গেরুয়াকরণ। রাজস্থানের পাঠ্যসূচির সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগে যেমন সম্প্রতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রাণা প্রতাপাদিত্য আর সশ্রীট আকবরের হলদিঘাটের যুদ্ধের এক বিকল্প আখ্যান, তাতে বলা হয়েছে এই যুদ্ধে পরাজিত হন আকবর। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএস এবং এই সংগঠনের সাভারকারের মতো নেতার ভূমিকা নিয়েও বিকল্প এক আখ্যান উঠে আসছে। এই গেরুয়া ইতিহাসের সঙ্গে সাভারকারের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোশের এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতির বিষবৃক্ষ রোপণের ইতিহাস মেলানো মুশকিল।

তাহলে কি ইতিহাস বিকল্প কিছু আখ্যান (narrative) মাত্র যাদের তুলনা করা যায় না? সাবঅলটার্ন স্ট্যাডিজের ইতিহাসচর্চা, যাতে দীপেশদা প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন, এবং এই বইয়ের একাধিক প্রবন্ধে যার প্রসঙ্গ উঠে আসে, সেখানেও এরকম কিছু প্রশ্ন ওঠে। এলিটরা যে-ইতিহাস লেখেন তাতে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষদের জায়গা নেই, এই

পক্ষপাত দূর করার অভিপ্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং বিতর্কের অতীত। ইতিহাসচর্চার এক সুন্দর সংজ্ঞা ‘ইতিহাসের মৃত্যু?’ প্রবন্ধে দীপেশদা দিয়েছেন—তা হলো অপস্রিয়মাণ (বা অন্তর্হিত) সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণ। এই দিক থেকে দেখলে যাদের কণ্ঠ ইতিহাসের পাতায় অনুপস্থিত, তাদের বলতে দেওয়া ইতিহাসচর্চার এক আবশ্যিক অংশ হওয়াই উচিত। আবার, রাজনৈতিক দিক থেকে ভাবলে তা গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসারের এক আবশ্যিক অঙ্গও বটে—রাজারাজড়া বা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক হর্তাকর্তা বা দেশীয় অভিজাতবর্গের ব্যাখ্যানই শুধু আমরা শুনব কেন?

কিন্তু সমস্যা হলো, শুধু সাবঅলটার্ন স্টাডিজ নয়, যেকোনো ইতিহাসচর্চায় বিভিন্ন আখ্যানে যখন বিপরীতমুখী ছবি ফুটে ওঠে তখন কী করণীয়? বিভিন্ন আখ্যান জুড়ে যদি শুধুই সম্পূর্ণতর একটা ছবি ফুটে উঠত, তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু হলদিঘাটের যুদ্ধে কে জিতেছিলেন, সশ্রুট আকবর না রাণা প্রতাপ? রাম লক্ষা অভিযান করেছিলেন রাবণ তাঁর স্ত্রীকে অন্যায়াভাবে অপহরণ করায়, না কি এ ছিল এক পরিচিত ছকের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যাতে অন্যায়া উপায়ে (যেমন, মেঘনাদ-বধ) স্বাধীনচেতা এক রাজাকে হারিয়ে তার জায়গায় পেটোয়া এক শাসককে বসিয়ে আসা হয়েছিল? সতীদাহ প্রথা রদ কি স্থানীয় মানুষের নানা প্রথা ও রীতিনীতি পালন করার স্বাধীনতার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঔপনিবেশিক সরকারের এক অগণতান্ত্রিক ফরমান? না কি সর্বজনীন মানবিকতার এবং নৈতিকতার অবস্থান থেকে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির ওপর জোর করে চাপানো অমানবিক এক প্রথার হাত থেকে তাদের রক্ষা করা? বাংলায় তেতাল্লিশের মন্বন্তর হয়েছিল কৃষি উৎপাদন কম হবার জন্যে, না কি ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক নীতির কারণে, না কি যুদ্ধের কারণে পরিবহণব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায়, না কি চাহিদা বাড়ায় কালোবাজারীদের ফাটকাবাজারি কারণে, না কি প্রাদেশিক সরকারের অপদার্থতা এবং মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলির নিষ্পৃহতার কারণে?

অর্থনীতিবিদ হিসেবেও প্রত্যহ এই ধরনের কিছু বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। অল্প কিছু তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক বয়ান বা তত্ত্ব খাড়া করা যায়। কিন্তু তাদের কোনটা ঠিক বা প্রত্যেকটিই আংশিকভাবে সত্যি হলেও, তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটা, তা অনেকসময়ই সন্তোষজনকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। দলমত নির্বিশেষে অর্থনীতিবিদরা মোটামুটি একমত যে এর নিষ্পত্তি একভাবেই করা যায়—আরও তথ্য আহরণের মাধ্যমে, যাতে বয়ানে-বয়ানে ফারাক করা যায়। যদি কোনো জিনিসের দাম খুব বেশি, তা জোগান কম হওয়া বা চাহিদা বেশি হওয়ার জন্য হতে পারে, অথবা ফাটকাবাজারি কারণে। অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন মন্বন্তরের সময় কৃষি উৎপাদন ঐতিহাসিকভাবে কম ছিল না, তাই এই তথ্য অন্তত একটি ব্যাখ্যাকে বাতিল

করতে পারে। এ-রকম আরও অনেক গবেষণা প্রয়োজন এই বিষয়ে আমাদের ধারণায় স্বচ্ছতা আনার জন্যে।^১ এখানে আমি যা বলছি—তথ্য থেকে ব্যাখ্যান আবার তার থেকে বিকল্প ব্যাখ্যান, এদের দ্বন্দ্ব মেটাতে আরও তথ্যের আহরণ—তা খুবই সহজ কথা এবং এ-নিয়ে বিতর্কের অবকাশ কম। অনেকসময়ই ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে উপযুক্ত তথ্য আহরণ সহজ নয়, অর্থনীতির মতো সমীক্ষা করা যায় না, তাই কিছু বিতর্কের সম্ভোষণক সমাধান হয় না। সেখানে যত আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা ব্যাখ্যান জোগাড় করা যায়, ততই আমাদের চিন্তা সমৃদ্ধ হয়। আর সেখানেই সাবঅলটার্ন স্টাডিজের ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সমস্যা হলো, সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা—সে ইতিহাসচর্চার মাধ্যমেই হোক বা অর্থনীতি—কখনোই নৈর্ব্যক্তিক তথ্য-নির্ভর বিশ্লেষণে আটকে থাকে না, সেখানে তথ্যের বিকল্প ব্যাখ্যার মতো মতাদর্শ এবং নীতি ও বিচারবোধের সংঘাত অনিবার্য। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, আলোকপ্রাপ্তি এবং আধুনিকতার মূলধারার বয়ানে (তা সাম্রাজ্যবাদীই হোক, বা বাম-উদারবাদীই হোক) দেশজ সংস্কৃতি, রীতিনীতিকে অনগ্রসর হিসেবে দেখা হয়েছে। মানুষের বহুমাত্রিক আত্মপরিচিতিতে অগ্রাহ্য করে তার ওপরে ‘শ্রমিক’, ‘কৃষক’, ‘দরিদ্র’ বা ‘পশ্চাৎপদ শ্রেণির সদস্য’ গোছের কোনো সাধারণ তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তার মতের তোয়াক্কা না করে কীভাবে তার প্রগতি হবে সেই রাজনৈতিক আন্দোলন বা সরকারি নীতি বা পরিকল্পনা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দিক থেকে দেখলে ‘অন্ধকার মহাদেশে সভ্যতা-বিস্তারী’ ঔপনিবেশিক সরকার আর স্বাধীন ভারতে আধুনিক উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রের কর্মপ্রণালীর মধ্যে খুব একটা তফাত নেই। বিশ্লেষণী কার্যকারিতা এবং গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্যবোধ দুই থেকেই প্রগতিশীল আধুনিকতার এই কর্তৃত্বপূর্ণ চেহারা নিয়ে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের সমালোচনা আমার ঠিক মনে হয়েছে। কিন্তু একই সমালোচনা তো গোস্ামী বা কৌম নিয়েও করা যায়। কর্তৃত্বপূর্ণ রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক নয়, কিন্তু খাপ পঞ্চয়েতও তো গণতান্ত্রিক নয়। এই নিয়ে একটি খুব মনোগ্রাহী ঘটনার কথা দীপেশদার কাছেই শুনেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটিশ সেনার সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ চার্লস নেপিয়ারকে সতীদাহ রদ করা নিয়ে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা আপত্তি করলে উনি বলেন, সতীদাহ আপনাদের প্রথা হতে পারে, আমাদেরও কিন্তু এক প্রথা আছে—কোনো মহিলাকে পুড়িয়ে মারা হলে, যারা করেছে আমরা তাদের ফাঁসি দিই!

আসলে উত্তর-আধুনিকতাবাদ অনেক ক্ষেত্রে একটা আপেক্ষিক অবস্থান নেয়, যা সহজ ভাষায় হলো, তোমার সত্যি তোমার কাছে সত্যি, আমার সত্যি আমার কাছে সত্যি। কিছু কিছু বিষয়ে—যেমন ব্যক্তিগত জীবনে বা সাংস্কৃতিক আচার বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে—এই অবস্থান অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এর প্রথম সমস্যা হলো, ব্যক্তির ওপর

গোষ্ঠী তার সত্য চাপিয়ে দেয়, গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে তা মেনে নেওয়া যায় না। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, সবার ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব বিশ্বাস নিয়ে থাকার অধিকার আছে, কিন্তু সামাজিক স্তরে অন্তত কিছু আখ্যানের মধ্যে তো তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে পার্থক্য করা যায়, আর সেইসব ক্ষেত্রে যেসব আখ্যানের দিকে তথ্যের পাঞ্জা ভারী থাকে তাকে আধুনিকতাবাদের কর্তৃত্বপরায়ণ প্রবণতা বা এলিটদের ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধ দেওয়া হবে, মস্ত্রপড়া জল নয় (বা, সাম্প্রতিক উদাহরণ নিতে হলে গোমূত্র), সেখানে তথ্য এবং প্রমাণের পাঞ্জা যে প্রথমদিকে ভারী যেটা মানতেই হবে। এই ক্ষেত্রে যার যা বিশ্বাস তার জন্যে তাই সত্যি, এই অবস্থান নেওয়া সমর্থন করা যায় না।^১

এ-কথা ঠিক যে সাবঅলটার্ন স্টাডিজ এই অবস্থান নেয় না। ইতিহাসের গেরণ্যাকরণের প্রবণতার জন্যেও তাকে দায়ী করা যায় না। গেরণ্যাকরণের হোতাদের কাছে তথ্য-প্রমাণের কোনো মূল্য নেই আর তাদের মূল কর্মপ্রণালী হলো ওপর থেকে মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়া। এর কোনোটাই সাবঅলটার্ন স্টাডিজের অবস্থান নয়।^২ সেইরকম, বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্রে সারা বিশ্বে যে দক্ষিণপন্থী অসহিষ্ণুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার জন্যে উত্তর-আধুনিকতাবাদকে দায়ী করা যায় না, যেমন উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত গণতন্ত্রবিরোধী নীতির জন্যে আলোকপ্রাপ্তি জমানার যুক্তিবাদ ও আধুনিকতাবাদকে, পুঁজিবাদের সমস্ত সমস্যার জন্যে মূলধারার অর্থনীতিকে, বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যর্থতার জন্যে মার্কসের তত্ত্বকে দায়ী করা যায় না। আবার একইসঙ্গে, যেকোনো তত্ত্বের যদি কিছু যুক্তিগত পরিণাম থাকে, যা ঘটনাচক্রে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তাহলে 'তুই বিড়াল না মুই বিড়াল' গোছের তর্কে পরস্পরের ওপর দোষারোপ না-করে, সেগুলো বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজনে সেই তত্ত্বের পরিমার্জন করাই শ্রেয়।

আসলে কোনো একটি ক্ষমতাসীন চিন্তাধারার সমালোচনা যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসে, সেই ভাবধারাকে যদি নতুন ক্ষমতাসীন চিন্তাধারা বানানো হয়, তার সমালোচনা উঠে আসা অনিবার্য। দরবারি মার্কসবাদ নিয়ে দীপেশদা ইতিহাস বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে-সমালোচনা করেছেন, অর্থনীতি বিষয়ের প্রেক্ষাপট থেকে আমি তার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। ২০০৮-পরবর্তী আর্থিক সংকট পুঁজিবাদের সমালোচনায় মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে প্রমাণ করেছে। কিন্তু তাতে সমাজতন্ত্রের যে কেন্দ্রীভূত মডেল, তার ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে না। সে-রকমই, আধুনিকতার যে এক সরলীকৃত কাঠামো বাম-জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার কেন্দ্রে ছিল, তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে অসন্তোষ অনিবার্য ছিল। কিন্তু আধুনিকতার তাত্ত্বিক অবস্থানকে সমালোচনা করা মানে তার তাত্ত্বিক কাঠামো সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে তা তো নয়।

৩

আত্মজৈবিক সূত্র ধরে শুরু করতে গেলে বলতে হয় আটের দশকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় দীপেশ চক্রবর্তীর নাম প্রথম শুনি তাঁর সমসাময়িকদের কাছ থেকে, যাটের উত্তাল দশকে নানা বর্ণময় ছাত্রদের মধ্যে একজন হিসেবে। পরবর্তী জীবনে আমার বাবার সঙ্গেও তাঁর আলাপ এবং সৌহার্দ্যের সম্পর্ক হয়েছিল, যদিও তা কলেজ-সূত্রে নয়। তারপর তাঁর লেখা *Rethinking Working-Class History* (1989) বইটির কিছু অংশ আমাদের পাঠ্য ছিল দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্লাসে, পড়াতেন সঞ্জয় সুব্র্যমনিয়াম। কলকাতায় বিদ্যাচর্চার তৎকালীন বাম-নাম-সত্য-হ্যায় পরিবেশে এই ধরনের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি খুব একটা। আর যেটুকু শুনেছি ইতিহাসচর্চার নতুন ধারা সাবঅলটান স্টাডিজের নাম নিয়ে ফিসফাস, তা তদানীন্তন বিপ্লব-হলে-সব-ঠিক-হয়ে-যাবে আর যাহাই-শ্রেণি-সংগ্রামের-ইতিহাস-নয়-তাহাই-ঘোর-প্রতিক্রিয়াশীল এই ধরনের মানসিক ফিল্টার পেরিয়ে মরমে পশেনি। পাঠ্য হিসেবে পড়তে গিয়ে বিষয় ও বক্তব্যের প্রতি বেশ আগ্রহ হয়েছিল এবং সেইসময় মতাদর্শগত ব্যবধান সত্ত্বেও সঞ্জয়ের পড়ানোও বেশ ভালো লাগত, কিন্তু তখন দু-চোখে অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে মুগ্ধতার ঘোর, অন্য কোনোদিকে ভালো করে মন দেবার অবকাশ হয়নি।

তারপর দীপেশদার সঙ্গে মুখোমুখি প্রথম আলাপ বস্টনের একটি আলোচনাসভায়, ১৯৯৬ সালে। তিনি বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় মনে নেই তবে তাঁর স্বচ্ছ, ঋজু আর বুদ্ধিদীপ্ত বাচনভঙ্গি এবং প্রশ্নোত্তর-পর্বে শাণিত কিন্তু স্নিগ্ধ রসবোধ মনে দাগ কেটেছিল। লালমোহনবাবুর ভাষায় বলতে হলে, ইচ্ছে হয়েছিল ভদ্রলোককে একটু কালটিভেট করার। সেইসময়ে দীপেশদা অস্ট্রেলিয়ার বহুদিন কর্মরত থাকার পর সদ্য শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন, আর আমি সদ্য উক্টরেট-ডিগ্রিপ্রাপ্ত সাবালক হয়ে সেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। নৈশভোজের আসরে যখন আলাপ হলো, তাঁকে পেশাগতসূত্রে অধ্যাপক চক্রবর্তী বা বাবার সঙ্গে আলাপের সূত্রে দীপেশকাকা ডাকাই যেত, কিন্তু এমনই তাঁর উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যে দাদা ডাকটি অনিবার্য ছিল। তারপর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী হবার সুবাদে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়। বহু আড্ডার সুখস্মৃতির আভায় কিস্বার্ক অ্যান্ডিনিউ-এ দীপেশদার সেইসময়ের বাড়ি আমার ব্যক্তিগত মানচিত্রে এক উজ্জ্বল ঠিকানা।

বাংলা সাহিত্যে দাদা-দের বড়ো একটা ভূমিকা আছে। টেনিদা, ঘনাদা, ফেলুদা থেকে শুরু করে ব্রজদা আর ঋজুদা। একদিক থেকে তাঁরা কথায় বা গুণে সমীহ আদায় করে নেন কিন্তু শ্রদ্ধায়, অনুরাগে, খুনসুটিতে এবং মান-অভিमानে আবার তাঁরা খুব কাছের লোকও হয়ে ওঠেন। ব্যোমকেশ আছে, আছে কিরীটী, লালমোহন আর কাকাবাবু,

কিন্তু তাদের দাদা ডাকতে স্বচ্ছন্দবোধ হয় না—সমীহ এবং অনুরাগ আদায় করে তাঁরা নাযকোচিত, কিন্তু খানিকটা দূর আকাশের তারা হয়েই থেকে যান আমাদের কাছে। দাদা হবার জন্যে তাই একইসঙ্গে খানিক মুগ্ধতা খানিক সমানে-সমানে বন্ধুত্বের সম্পর্ক, এই দুটি উপাদানের উপস্থিতি আবশ্যিক। আমার কাছে দীপেশদা এ-রকমই একজন দাদা আর তাঁর শিকাগোর বাড়ির বৈঠকখানা ছিল পটলডাঙার রোয়াক বা কফি হাউসের সেই আড্ডাটির মতো প্রবাসের কর্মব্যস্ত কিন্তু একাকী জীবনে এক মরদ্যানের মতো। বাংলাবাসী পাঠক হয়তো ভাবছেন, আরে, এই আড্ডা তো আমাদের অতি-পরিচিত, ঘরে ঘরেই হয়। মনে রাখতে হবে, একদিকের টিকিট কেটে যারা আজীবন পরিচিত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিদেশযাত্রা করে, সেই যাবাব প্রবাসী জীবনে এ-রকম আড্ডার ঠেক হলো অতিদূর সমুদ্রের মাঝখানে পথভ্রান্ত নাবিকের দারুচিনি দ্বীপের ভিতর সবুজ ঘাসের দেশ দেখার মতো।

এই আড্ডায় দীপেশদার সঙ্গে উত্তর-আধুনিকতাবাদে আপেক্ষিকতার সমস্যা বা বামপন্থার বিশ্বব্যাপী সংকট নিয়ে গভীর আলোচনায় সমৃদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য আর গান নিয়ে চর্চা, কলেজ ক্যান্টিনের এ-কালের সে-কালের তুখোড় প্যারডি (যা নিয়ে একটু বাদে আরও বলব), বা সম্প্রতি শোনা কোনো নেহাতই ফিচেল রসিকতার আদান-প্রদানের কিশোরসুলভ উচ্ছ্বাস সবই মিশে থাকত।

আসলে ভালো শিক্ষক হতে গেলে ভালো বন্ধু হতে হয়, যদিও বন্ধুত্বের ধরন ব্যক্তিবিশেষে আলাদা হতেই পারে। তা না হলে জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে, কিন্তু যুক্তি-তর্ক-গল্পো ছাড়া সে-জ্ঞান খানিকটা পুঁথিপড়া বিদ্যার মতোই থেকে যায়। তা দিয়ে হয়তো বিজ্ঞানে বা প্রযুক্তিবিদ্যায় কাজ চলতে পারে। কিন্তু ইতিহাস বা অর্থনীতির মতো যে-বিষয়গুলির ক্ষেত্রে হলো মানুষ, তাকে জানতে গেলে, চিনতে গেলে জনশ্রোতের নানান মত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, সেই জ্ঞানের ধারা কোনো-না-কোনো সময়ে শুকনো খাতে পরিণত হয়। এই সমস্যার লক্ষণ সারা পৃথিবীজোড়া রাজনৈতিক দখিনা হাওয়ার এই সময়ে, দীপেশদা যাকে দরবারি মার্কসবাদ বলেন তাতে যেমন প্রকট, আর আমার নিজস্ব বিষয়ের দিকে দেখলে, বাজারকেন্দ্রিক নয়া-ঋপদী অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তা ভীষণভাবেই দৃশ্যমান। সমাজবিজ্ঞান বা কলাবিদ্যার ক্ষেত্রে, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই, কথটা খুবই সত্য। আর তাই যদি হয়, তাহলে পুঁথিভিত্তিক বিদ্যাচর্চা আর বিমূর্ত তত্ত্বের ওপর নির্ভর করলে পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা প্রবল। আসলে যেকোনো তাত্ত্বিক কাঠামোই কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন অপরিহার্য, আবার তার সীমাবদ্ধতা না বুঝে, তাকে সদা জীবনশ্রোতে সিঁধে না করে, পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে, কোনো-না-কোনো সময় তার প্রয়োগ ব্যর্থ হতে বাধ্য। তখন তা হয়ে ওঠে এক মতাদর্শগত অচলায়তন, যার কালশ্রোতে ভেসে যাওয়া অনিবার্য।

আড্ডা তাই শুধু অবসরবিলাস নয়, বিদ্যাচর্চার এক আবশ্যিক অনুষ্ণও বটে। কিন্তু অনেক আড্ডাই আবার হয়ে দাঁড়ায় কোনো বিশিষ্ট মানুষকে ঘিরে ভক্তকুলের শ্রদ্ধা বা আনুগত্য নিদর্শনের এক দরবারের মতো। খেলার মাঠে যেমন সমানে সমানে না খেললে খেলাটা ঠিক জমে না, আড্ডার আসরেও ঠিক সে-রকম। আমার কাছে দীপেশদার বাড়ির আড্ডার আকর্ষণ ছিল, সেখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বয়স বা পদ-নির্বিশেষে পারস্পরিক অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আবার আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে এ-ধরনের একটা গণতান্ত্রিক আবহাওয়াও ছিল, যেখানে মতবিরোধ এবং বিতর্ক ছিল আড্ডা জমার লক্ষণ। পরে আমার লন্ডনবাসের সময় যখন আরেকটা আড্ডার দল আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে, তার মধ্যে শিকাগোর সেই আড্ডার আসরের প্রভাব পড়েছে অনেকটাই।

তবে আড্ডা তো নিছক বুদ্ধিচর্চার বিকল্প মঞ্চ নয়, তা অবসর বিনোদনের এবং এক ধরনের সামাজিক আত্মীয়তাবোধের এক যৌথ-পরিবারসম বৈঠকখানাও বটে, যেখানে হাসিঠাট্টা থেকে সুখ-দুঃখের গল্পো সবই হতে থাকে পাশাপাশি। দীপেশদার রসবোধের কিছু উদাহরণ দিলে হয়তো তাঁর সান্নিধ্যের জীবনোচ্ছল দিকের খানিকটা ধরা পড়বে। কিছু অসাধারণ গান এবং বিখ্যাত গানের প্যারডি লিখেছেন তিনি। আশা করি কখনো সেগুলো একত্রিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। এই যেমন একটি 'ইংরেজিতে লেখা বাংলা ফোক সং' যা দীপেশদার স্বরচিত, একদম যথাযথ বাঙাল-ইংরেজি উচ্চারণে বেশ দরদ দিয়ে গাইতেন:

In our native village
there was a banyan tree
and we used to sit under it.
We used to sit under
River used to flow yonder
Cows used to come and wander
Everything was fresh and sweet
And we used to sit under it.

In the district Pabna
Village Porarbari, *bhai re*, village Porarbari
I used to have my
huge *taluqdari re*
mango, jackfruit we used to eat.

Oh my mind,
phorget what you left behind.
Phorget your days golden

Life is very uncertain
Tell yourself again again:
Nothing remains forever,
A king is also thrown on the street.

Aare, king may come and king may go
life remains as ever
No reason to cry over it!

[Crying in chorus: Don't make me cry any more brother, *kandaayo na aar amare bhaiyo*, Don't make me cry any more]

এই গানটির ‘we used to sit under it’ লাইনটি খুব টেনে টেনে আবেগ দিয়ে গাইতে হয়। গানটির মধ্যে যেমন দেশের মাটির প্রতি আন্তরিক আবেগ আছে, আবার ওপার বাংলা থেকে আসা সবাই বিশাল অবস্থাপন্ন জমিদার ছিলেন এই নিয়ে খানিক রসিকতাও আছে। অবশ্য সত্তা-রাজনীতির এই বাজারে এখানে বলে রাখা ভালো, পারিবারিক ইতিহাসসূত্রে দীপেশদা আর আমি দুজনেই বাঙালি!

রসিকতার তীর নিজেদের দিকে মাঝেমাঝে না চালালে তা শ্লেষই (sarcasm) থেকে যায়, যা পরনিন্দার এক বিকল্পমাত্র, কৌতুক (humour) হয়ে ওঠে না। পরের ‘বিদেশাত্মবোধক’ গানটি ‘খনধান্য পুষ্পভরা’-র প্যারডি, যার লক্ষ্য হলো আমাদের মতো প্রবাসীরা:

বিপদ-ব্যাধি-দুঃখ-জরা
তাই দিয়ে তো ভারত গড়া
তাহার চেয়ে চলো বাঁধি সাগরপারে ডেরা
আছে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি দেশ এক, সেল-এর জিনিস ঘেরা।
এতো জিনিস জন্মে কভু দেখোনিকো তুমি
ছি ছি এ কি লজ্জা ভারত আমার জন্মভূমি
ছি ছি তোমার জন্মভূমি
এ রাম মোদের জন্মভূমি।
চর্ব্যচোষ্যলেহাপেয়
কোথায় এতো পাবে কেহ
তাই তো প্রভুর শ্রীচরণে এই কামনা করি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন ওই দেশেতেই মরি।

শুধু ঐতিহাসিক বা পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে দীপেশদাকে দেখলে, এই অসম্ভব মজলিশি এবং পরিহাসপ্রিয় দিকটা ধরাই পড়বে না। এখানে আড্ডা ছাপিয়ে যায়

বিদ্যাচর্চার আনুষ্ঠানিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা। তাই, আশ্চর্য নয় যে দীপেশদার অ্যাকাডেমিক লেখাতেও আড্ডা বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে, একটি সামাজিক আচার হিসেবে, যাকে তিনি আধুনিকতার বিশ্বায়িত পৃথিবীতে অতীতের আরও এক যুথবন্ধ জীবনের অপস্রিয়মাণ চিহ্ন হিসেবে দেখেছেন।

8

পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি
সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি। . . .
চেনা শোনা জানার মাঝে কিছুই চিনি নি যে
অচেনায় হারায় তাই আবার খুঁজি নিজে।

সলিল চৌধুরী

শুরু করেছিলাম পথ নিয়ে সলিল চৌধুরীর এক বিখ্যাত গান দিয়ে, যা এই বইয়ের নামের অনুপ্রেরণা। শেষ করি পথ নিয়ে তাঁর আরেক বিখ্যাত গান দিয়ে। আসলে মনোরথের ঠিকানা তো কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নয়। কী জীবনে কী বিদ্যাচর্চায়, আসল গন্তব্য বা লক্ষ্য হলো সর্বদা চলতে পারা, মূলমন্ত্র হলো চরবেতি, চরবেতি। কখনো সোজা পথের ধাঁধায় পথ হারালে, চেনা শোনা জানার মাঝে কিছুই চিনি না মনে হলে, অচেনায় হারায় আবার খুঁজতে শুরু করা। নিষেধের পাহারাতে রেখে-ঢেকে না থেকে, পথেই হবে পথ চেনা এই বিশ্বাসই হলো মনোরথের ঠিকানা। পথ চলতে চলতে গন্তব্য শুধু পালটে যায় না, আমরাও পালটে যাই অভিজ্ঞতার অভিঘাতে। এ-এক সর্বজনীন সত্য, কিন্তু আমাদের মতো যারা প্রবাসী তাদের কাছে পথের পাঁচালি শুধু জীবনের রূপক নয়, আক্ষরিক বাস্তবও বটে।

এই যাবার জীবনে আমাদের দু-দণ্ড শাস্তি দেয় বন্ধুদের সান্নিধ্য, মনের মতো আড্ডার আকর্ষণ। যেখানে কথায়, গানে, তর্ক আর হাসিঠাট্টায় বায়স্কোপের বাক্সের মতো জীবন্ত হয়ে ওঠে ফেলে-আসা সময়ের স্মৃতি। দীপেশদার গল্পে যেমন আমার কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে দুই দশক আগের কলকাতা, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কফি হাউসের মতো পরিচিত দিকচিহ্ন। কিন্তু শুধুই বাঙালিয়ানা নয়, দেশ-গোষ্ঠীর সীমানা ছাড়িয়ে চিন্তার এবং বিদ্যাচর্চার বৃহত্তর জগতের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক নানা বিতর্কের চালচিত্রও ফুটে উঠত সেই আড্ডায়, মার্কসবাদ থেকে উত্তর-আধুনিকতাবাদ, ইতিহাস এবং অর্থনীতি বিষয়ের মধ্যে দার্শনিক পদ্ধতিগত পার্থক্য সত্তাভিত্তিক রাজনীতি আর প্রথাগত প্রগতিশীল রাজনীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সবই থাকত সেই আলোচনায়। তখন তা আর

ঘুমিয়ে থাকা ইতিহাস থাকত না, মনে হতো আমিও যেন ছিলাম সেখানে, কোনো বিতর্কে কারও কথা শুনে মনে হয়, আহা উত্তরে এটা বলে দিলে বেশ হতো। আড্ডা তখন হয়ে উঠত বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে কথোপকথনে এক ধরনের জীবন্ত ইতিহাসযাপন। কাগজে কলমে ইতিহাসের ছাত্র না হলেও, এই অভিজ্ঞতা কি কম মূল্যবান?

আমার সৌভাগ্য, জটিল এই সময়ে দীপেশদার মতো একজন অভিযাত্রীর সাহচর্যে খানিকটা পথ একসঙ্গে চলে, এবং পথচলার ফাঁকে নিছক আড্ডা মেরে সমৃদ্ধ হতে পেরেছি। আর আমাদের সবার সৌভাগ্য, এই প্রবন্ধসংকলনে সেই পথচর্চার অতি-উপভোগ্য কিন্তু গভীর উপলব্ধির আলোয় দৃপ্ত বৃত্তান্ত তাঁর প্রখর কিন্তু সরস ও স্নিগ্ধ গল্প করার ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে।

মৈত্রীশ ঘটক

তথ্যসূত্র

- ১ এই বিষয় নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে, গত সাত বছরে এই নিয়ে দুটি বইও প্রকাশিত হয়েছে---মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়ের *Churchill's Secret War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II* (New York: Basic Books, 2011) এবং জনম মুখোপাধ্যায়ের *Hungry Bengal: War, Famine and the End of Empire* (New York: Oxford University Press, 2015).
- ২ তবে তা সত্ত্বেও কেউ নিজের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কোনো বিশেষ ধরনের চিকিৎসা না করাতে চাইলে, কাউকে সেটা জোর করে করা যায় না যদি-না সেটা ছোঁয়াচে রোগ হয়, যেক্ষেত্রে গণস্বাস্থ্যের খাতিরে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা মানা যায় না।
- ৩ এই বিষয়ে দীপেশ চক্রবর্তীর ‘Radical Histories and Question of Enlightenment Rationalism: Some Recent Critiques of Subaltern Studies’, *Economic and Political Weekly of India*, vol. 30, no. 14, 8 April 1995, pp. 751–9 দ্রষ্টব্য।